# অন্তরাগের উপাখ্যান

## জিনাত মিলন সুইটি



# অন্তরাগের উপাখ্যান

জিনাত মিলন সুইটি

**প্রকাশনায়**

বইঝুলি

**প্রকাশক**

সবুজ হুসাইন
জহির উদ্দিন

**প্রথম প্রকাশ**

২০২৬

© ২০২৬ জিনাত মিলন সুইটি

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই বইয়ের কোনো অংশ লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো মাধ্যমেই—মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, ইলেকট্রনিক সংরক্ষণ, অডিও, ভিডিও বা অন্য কোনো উপায়ে—পুনঃপ্রকাশ, সংরক্ষণ বা বিতরণ করা যাবে না।

**প্রচ্ছদ**

সবুজ হুসাইন

মূল্যঃ ৫২০ টাকা

ISBN: 978-984-29929-1-9

**অনলাইন পরিবেশক**: boijhuli.shop

# উৎসর্গ

## আমার স্বামীকে

যিনি আমার লেখা পড়েন নাই,

কিন্তু প্রশংসার সময় এমন পঞ্চমুখ হন,
যেন বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ
তাঁর ঘরেই বসে আছে।
তবে তার জন্য বই প্রকাশ এর সাহস করেছি।

আর আমার প্রিয় বান্ধবী সুপ্তিকে।
যে ছোটবেলায়  আমার হযবরল লেখাগুলো পড়ে

এমনভাবে অ্যাপ্রিশিয়েট করত,
যেন আমি না লিখলে বাংলা সাহিত্য
এক বিরাট ক্ষতির মুখে পড়বে।

একজন না পড়েই প্রশংসা করেছে,
অন্যজন পড়ে প্রশংসা করেছে।
এই বইয়ের পেছনে দুজনের অবদানই অনস্বীকার্য।

তোমাদের দুজনকে ভালোবাসা।



# ভূমিকা

সূর্যাস্তের শেষ আলোটুকু যখন মিলিয়ে যায়, তখন যে অন্ধকার নেমে আসে—তা যেমন এক সমাপ্তি, ঠিক তেমনি আরেক সূচনা। কিছু সম্পর্ক এই গোধূলির আলোর মতোই আবছা, যেখানে ভালোবাসা আর ধ্বংসের দূরত্ব থাকে মাত্র অল্পকিছুদূর।

'অস্তরাগের উপাখ্যান' মূলত দুই প্রজন্মের এমন এক টানাপোড়েনের গল্প, যা আমাদের চেনা সম্পর্কের ভেতরের অচেনা অন্ধকারগুলোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

প্রথম অধ্যায়ে আছে এক তীব্র দহন। মানুষের মন কতখানি ভঙ্গুর হলে সামান্য একটা সন্দেহের কুয়াশা পুরো একটা জীবন্ত সংসারকে গ্রাস করে নিতে পারে, এক নিমিষে ধ্বংস করে দিতে পারে কয়েকটি সাজানো জীবন—সেই গল্পই লুকিয়ে আছে এই পর্বে। যেখানে ভালোবাসা রূপ নেয় এক অন্ধ আক্রোশে। আর তার ঠিক পিঠোপিঠি শুরু হয় দ্বিতীয় অধ্যায়ের পথচলা। এটি এক নীরব দীর্ঘশ্বাসের গল্প। আমরা অনেকেই সময় থাকতে মনের সবচেয়ে জরুরি কথাটি মুখে ফুটিয়ে বলতে পারি না। থমকে থাকি কোনো এক অদৃশ্য দেয়ালে। কিন্তু সময় যখন ফুরিয়ে যায়, তখন সেই না-বলা কথাটুকুই যে সারাজীবনের জন্য একটা জীবন্ত মানুষকে আক্ষেপের জীবশ্ম বানিয়ে দেয়।

'অস্তরাগের উপাখ্যান'-এর পাতায় পাঠক এক তীব্র কৌতূহল এবং এক বুক আবেগ নিয়ে গল্পটির শেষ পর্যন্ত হেঁটে যাবেন।

— শামসুদ্দিন, এত সকালে কোথায় যাচ্ছিস?

রওশন আরার গলা উঠোনের বারান্দা থেকে ভেসে এলো। শামসুদ্দিন পা থামিয়ে মায়ের দিকে তাকাল। তার গায়ে সাদা পাঞ্জাবির ওপর একটা পাতলা চাদর জড়ানো। হাতে লাঠি নেই, মাথায় কোনো পাগড়িও নেই। বাড়ির বাইরে যাওয়ার জন্য মানুষ যেমন সাধারণভাবে বের হয়, সে ঠিক তেমনই বের হয়েছে।

— দক্ষিণের জমিটা একবার দেখে আসব। করিম বকস সঙ্গে আছে।

রওশন আরা একটু ভ্রু কুঁচকে বললেন, — কালও তো গিয়েছিলি।

— কাল উত্তর দিকটা দেখেছি। আজ দক্ষিণটা দেখব।

— তুই না গেলে কি জমি পড়ে থাকবে?

শামসুদ্দিন মৃদু হেসে বলল, — জমি ঠিকই পড়ে থাকবে মা। মানুষগুলো থাকবে না।

রওশন আরা আর কিছু বললেন না। ছেলের স্বভাব তিনি ভালো করেই জানেন। কোনো কাজ একবার মাথায় নিলে সেটা শেষ না করে তার মনে শান্তি আসে না।

সন ১৯৫২।

সিমুলতলী তখনও পুরোনো দিনের এক নিভৃত গ্রাম। কাঁচা রাস্তার দুপাশে সারি সারি তাল, নারকেল, সুপারি আর শিমুলগাছ দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষায় রাস্তার নিচু জায়গাগুলো পানিতে ডুবে একাকার হয়ে যায়, আর শীতে মাটির ওপর পড়ে ধুলোর পুরু আস্তরণ। গ্রামের ঘরবাড়িগুলো বেশির ভাগই মাটির, কোথাও জরাজীর্ণ টিনের চাল, কোথাও বা খড়ের ছাউনি। এই গ্রামের ঠিক মাঝখানে মির্জা পরিবারের পুরোনো বাড়িটি অন্য সব বাড়ির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। উঁচু পাকা ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল দোতলা বাড়ি। সামনে প্রশস্ত উঠোন, চারপাশে লম্বা টানা বারান্দা। মোটা কাঠের দরজা, পুরোনো আমলের জানালা, দেয়ালের গায়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সময়ের গভীর ছাপ। বাড়ির পেছনে একটা বড় পুকুর, তার ওপারে ঘন বাগান। একসময় এই বাড়িতে প্রতিদিন শত শত মানুষের যাতায়াত ছিল। এখন লোকজন অনেক কমেছে, কিন্তু বাড়িটির বিশাল আকার আর পুরোনো ঐশ্বর্যের চিহ্নগুলো এখনও চারদিকে স্পষ্ট।

জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে দু'বছর আগেই। মির্জা পরিবার আইনত আর জমিদার নয়। তবু গ্রামের মানুষের কাছে এই বাড়ির নামের সঙ্গে পুরোনো দিনের একটা

আলাদা মর্যাদা জড়িয়ে আছে। পরিবারের জমিজমা, পুরোনো সম্পত্তি আর এই বিশাল বাড়ির দেখাশোনার পুরো দায়িত্ব এখন শামসুদ্দিনের ওপর। বয়স তার খুব বেশি নয়। কিন্তু বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর সংসার আর সম্পত্তির এই বিশাল ভারটা তার তরুণ কাঁধেই এসে পড়েছে।

সেদিন সকালেও বাড়ির সামনের পথ দিয়ে দুজন সাধারণ কৃষক যাচ্ছিল। শামসুদ্দিনকে দেখে একজন দাঁড়িয়ে গেল।

— সালাম, মির্জা সাহেব।

— ওয়ালাইকুম সালাম।

লোকটা একটু ইতস্তত করে বলল, — দক্ষিণের জমির আলডা লইয়া একটু ক্যাচাল হইছে।

শামসুদ্দিন থমকে থামল।

— কী হয়েছে?

— পাশের গেরামের মাইনষেরা নাকি আলডা একটু সরাইয়া লইছে। আমরা কইলাম, আগের জাগাতেই আছিল। তারা হেই কথা মানতেছে না।

করিম বকস তখন পা চালিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

শামসুদ্দিন বলল, — তোমরা এখন কাজে যাও। আমি নিজেই গিয়ে দেখে আসছি।

লোকটা আশ্বস্ত হয়ে মাথা নেড়ে চলে গেল। শামসুদ্দিন আর করিম বকসও দক্ষিণের পথ ধরল। এ ধরনের ছোটখাটো বিষয় এখন প্রায়ই তার সামনে আসে। কোথাও জমির সীমানা নিয়ে কথা, কোথাও পুকুরের পানি ব্যবহার নিয়ে সমস্যা, কোথাও বা পুরোনো বাঁধ মেরামতের প্রয়োজন। আগের মতো জমিদারি নেই, কিন্তু পরিবারের যে জমিজমা এখনও অবশিষ্ট আছে, সেগুলোর দেখাশোনা তো করতেই হয়।

দক্ষিণের জমিতে গিয়ে শামসুদ্দিন অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। করিম বকস তাকে আলটা দেখাল, পাশের জমিটাও ঘুরিয়ে দেখাল। শামসুদ্দিন নিজের চোখে জায়গাটা ভালো করে দেখে নিল।

— কাল লোক এনে আলটা ঠিক করে দিও, করিম বকস।

— জি আচ্ছা।

— আর পাশের লোকদের সঙ্গে কোনো ঝামেলা করবে না। আগে শান্ত হয়ে কথা বলবে।

— জি, মির্জা সাহেব।

ফিরে আসার পথে দু-একজন গ্রামের মানুষ তাকে দেখে সালাম দিল। কেউ জমির কথা বলল, কেউ পুকুরের কথা, কেউ আবার নিজের কোনো ছোটখাটো পারিবারিক সমস্যার কথা জানাল। শামসুদ্দিন সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল, প্রয়োজনীয় কথাটুকু বলল, তারপর বাড়ির দিকে ফিরল।

দুপুরের দিকে যখন সে বাড়িতে ঢুকল, রওশন আরা তখন বারান্দায় বসে ছিলেন। ছেলেকে দেখে বললেন, — সব দেখে এলি?

— হ্যাঁ।

— খেয়েছিস কিছু?

শামসুদ্দিন মায়ের পাশে এসে বসে বলল, — না।

রওশন আরা বিরক্ত মুখে বললেন, — সারাদিন দুনিয়ার মানুষের জমি-জমা দেখতে পারিস, নিজের খাওয়ার কথা একবারও মনে থাকে না?

শামসুদ্দিন হেসে ফেলল।

— এখন খাচ্ছি তো।

রওশন আরা ভেতরের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছেড়ে বললেন, — খাবার দিতে বলছি। তুই হাত-মুখ ধুয়ে আয়।

শামসুদ্দিন উঠে গেল। পুরোনো বাড়িটির ভেতর তখন দুপুরের স্বাভাবিক ব্যস্ততা। রান্নাঘর থেকে হাঁড়ি-পাতিলের শব্দ আসছে, উঠোনে কাজের লোকজনের অলস চলাফেরা, দূরে পুকুরপাড় থেকে কারও অস্পষ্ট ডাক শোনা যাচ্ছে। মির্জা বাড়িতে দিনটা অন্য দিনের মতোই কাটছিল।

দুপুরের খাবার শেষ করে শামসুদ্দিন কিছুক্ষণ বারান্দার আরামকেদারায় বসে রইল। মির্জা বাড়ির সামনের উঠোনে তখন কয়েকজন মানুষ এসে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজনকে দেখে শামসুদ্দিন চট করে চিনতে পারল।

— রহিম, তুমি এখানে কেন?

লোকটি একটু এগিয়ে এসে মাথা নিচু করল।

— মির্জা সাহেব, একটু দরকার আছিল।

— বলো।

রহিম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমতা আমতা করে বলল, — মাইয়াডার বিয়ার কথা ঠিক হইছে। কিন্তু ঘরের অবস্থা তো জানেনই। কিছু ট্যাকার বড় দরকার আছিল।

শামসুদ্দিন তার দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে রইল।

— কত?

রহিম একটা অঙ্ক বলল। শামসুদ্দিন আর কোনো দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না।

— কাল সকালে করিম বক্সের কাছ থেকে নিয়ে যেও।

রহিম যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না।

— মির্জা সাহেব...

— কী?

— ট্যাকা কবে ফেরত দিতে হইবো?

শামসুদ্দিন শান্ত গলায় বলল, — পারলে দিও। না পারলে দেওয়ার কোনো দরকার নেই।

রহিমের চোখ দুটো মুহূর্তেই ভিজে উঠল।

— আল্লাহ আপনার ভালো করুক।

শামসুদ্দিন হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল।

— যাও। মেয়ের বিয়ের কাজ করো।

লোকটা চলে গেলে বারান্দার এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা করিম বকস মৃদু হেসে বলল, — আপনে কাউরে কোনোদিন খালি হাতে ফেরান না।

শামসুদ্দিন তার দিকে তাকাল।

— সবাইকে দেওয়া যায় না, করিম বকস।

— কিন্তু যেগোরে দ্যান, হেগোর কথাও আর মনে রাখেন না।

— মনে রাখার জন্য দিই না।

এই কথাটুকু বলেই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শামসুদ্দিনের স্বভাবটা ঠিক এমনই। মানুষের বিপদ দেখলে তার মনটা কেমন যেন নরম হয়ে যেত। কারও ঘরে খাবার নেই, কারও চিকিৎসার টাকা নেই, কারও মেয়ের বিয়ে—সাধ্যমতো সাহায্য করত। কিন্তু সেই মানুষটিই নিজের কোনো সিদ্ধান্তে একবার স্থির হলে

তাকে সেখান থেকে নড়ানো অসম্ভব ছিল। মায়ের কথাতেও সে সবসময় নরম হতো না।

রওশন আরা ছেলের এই স্বভাবটা বহু বছর ধরে দেখছেন। বিকেলের দিকে তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন, — দক্ষিণের জমির ব্যাপারটা নিয়ে আবার লোক পাঠাসনি তো?

— পাঠিয়েছি।

— এত তাড়া কীসের তোর?

— আলটা দ্রুত ঠিক করতে হবে।

— কাল করলেও তো হতো।

শামসুদ্দিন মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, — কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনো দরকার নেই মা।

রওশন আরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, — সবকিছু কি নিজের মতো করেই করতে হবে?

— যেটা ঠিক মনে হয়, আমি সেটাই করব।

— তুই ছোটবেলা থেকেই ঠিক এমন একগুঁয়ে।

শামসুদ্দিন কোনো উত্তর দিল না। রওশন আরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যদিকে তাকালেন।

বিকেল নামার আগেই বাড়ির পেছনের দিক থেকে কয়েকজন লোক এসে উঠোনে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে কাদের, মজনু, হাশেম আর নুরু—চারজনই বহুদিনের পুরোনো মানুষ। তাদের বয়সও এখন কম নয়। হাতে লাঠি, পরনে সাধারণ পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি। তারা একসময় মির্জা পরিবারের নামকরা লাঠিয়ালদের মধ্যে ছিল। জমিদারি নেই, আগের মতো খাজনা তোলার কোনো ব্যবস্থাও নেই। কিন্তু বাড়ির নিরাপত্তা আর পরিবারের প্রয়োজনে কয়েকজন পুরোনো লোক এখনও মির্জা বাড়ির মায়া ছাড়তে পারেনি।

কাদের একটু এগিয়ে এসে বলল, — মির্জা সাহেব, উত্তর দিকের বাঁশঝাড়ের কাছে দুইজন অচিন মানুষ ঘোরাঘুরি করতেছিল।

শামসুদ্দিন জিজ্ঞেস করল, — তাদের সঙ্গে কথা বলেছ?

— জি।

— কী বলল তারা?

— পাশের গেরামের লোক। পথ ভুল কইরা এইদিকে আইসা পড়ছে বলে কইলো।

শামসুদ্দিন কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে ভাবল।

— তাহলে আর কিছু করার দরকার নেই।

মজনু বলল, — আমরা ভাবছিলাম ধইরা নিয়া আইসা পড়ি।

শামসুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে কঠোর চোখে তাকাল।

— না।

তার গলায় এবার তীব্র কঠোরতা স্পষ্ট।

— শুধু সন্দেহ হয়েছে বলে কাউকে ধরে আনবে না। কারও সঙ্গে কোনো অন্যায় করবে না।

চারজনই তৎক্ষণাৎ চুপ করে গেল। শামসুদ্দিন আবার বলল, — এই বাড়ির একটা নাম আছে বলে গ্রামের সাধারণ কাউকে ভয় দেখানোর অধিকার তোমাদের কেউ দেয়নি। বুঝেছ?

— জি, মির্জা সাহেব।

— যাও এখন।

লোকগুলো চুপচাপ সরে গেল। করিম বকস পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে মৃদুস্বরে বলল, — আপনের রাগডারে সবাই বড় ভয় পায়।

শামসুদ্দিন সেদিকে তাকাল না।

— অন্যায় করলে আমার রাগ ভয় পাওয়ার মতোই হওয়া উচিত, করিম বকস।

কিছুক্ষণ পর রওশন আরা আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

— কাদেরদের সঙ্গে কী কথা হলো রে?

— কিছু না। উত্তর দিকে অচেনা লোক ঘুরছিল।

— মারধর করেনি তো ওদের?

— না।

রওশন আরা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু আশ্বস্ত হয়ে বললেন, — ভালো করেছিস।

শামসুদ্দিন মায়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, — তোমার ছেলে এতটা খারাপও না মা।

রওশন আরা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, — সেটা আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু তুই একবার কিছু ধরে বসলে তোকে বোঝানো যে কত কঠিন, তা শুধু আমিই জানি।

শামসুদ্দিন এবার আর কোনো কথা বলল না।

সন্ধ্যার ঠিক একটু আগে উঠোনে আবার কয়েকজন গ্রামের মানুষ এল। কারও জমির সমস্যা, কারও পারিবারিক বড় ঝামেলা। শামসুদ্দিন বারান্দায় বসে একে একে সবার কথা শুনল। যে বিষয়ে তার সাহায্য করার দরকার, সেখানে সে উদারভাবে সাহায্য করল। আর যে বিষয়ে গ্রামের মানুষ নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারে, সেখানে স্পষ্ট করে বলল, তোমরা নিজেরাই বসে মিটমাট করে নাও, সব ছোটখাটো বিষয়ে আমার কাছে আসবার কোনো দরকার নাই। মানুষগুলো মাথা নেড়ে চলে গেল।

সূর্য তখন পশ্চিম আকাশের কোলে ঢলে পড়েছে। মির্জা বাড়ির পুরোনো ক্ষয়ে যাওয়া দেয়ালে দিনের শেষ সোনালি আলো এসে পড়েছে। উঠোনে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়া বাড়ছে। শামসুদ্দিন বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গ্রামের আঁকাবাঁকা পথের দিকে তাকিয়ে রইল। তার চারপাশে এই পুরোনো বাড়ি, পুরোনো মানুষ আর পুরোনো সম্পর্ক—সবকিছুই যেন নিজের এক মন্থর নিয়মে চলছিল। আর সেই নিয়মের মাঝখানে একলা দাঁড়িয়ে ছিল সে—কখনও বজ্রের মতো কঠোর, কখনও অকারণে বড্ড নরম; কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তের জায়গায় একচুলও না-সরা এক আশ্চর্য মানুষ।

বিকেলের শেষ সোনালি রোদ তখন মির্জা বাড়ির পুরোনো দালানের নোনাধরা কার্নিশে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। উঠোনে দক্ষিণের পুকুরপাড়ের সীমানা নিয়ে গ্রামের মানুষের যে চেনা জটলা আর উচ্চবাচ্য চলছিল, শামসুদ্দিন বারান্দা কাঠের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত শান্ত কিন্তু পাথরের মতো এক দৃঢ় গলায় তা থামিয়ে দিল। সে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল, — আমি কারও এক ইঞ্চি জমিতেও অন্যায়ভাবে হাত দিতে বলিনি। যার যতটুকু পৈতৃক সীমানা, ঠিক ততটুকুই থাকবে। মাঝবয়সী এক কৃষক মাথা নিচু করে আমতা আমতা করে কিছু বলতে চাইলে শামসুদ্দিন করিম বক্সের দিকে তাকিয়ে হুকুমের সুরে বলল, — করিম বকস, কাল সকালেই আমিন ডেকে জায়গাটা নিখুঁতভাবে মাপার ব্যবস্থা করো, দুপক্ষের মানুষই যেন সেখানে হাজির থাকে। আর মনে রেখো, আজ থেকে কেউ নিজের হাতে কোনো কিছু করতে যাবে না, গ্রামের ভেতর কোনো ধরনের অশান্তি হলে আমি কিন্তু কাউকেই রেহাই দেব না। তার গলার আওয়াজে কোনো চিৎকার ছিল না, কিন্তু এমন এক অমোঘ মির্জা বংশীয় শাসন ছিল যে উপস্থিত গ্রামবাসীদের আর কেউ একটা কথাও বাড়াতে পারল না এবং তারা সবাই একে একে মির্জা সাহেবকে সেলাম জানিয়ে উঠোন ফাঁকা করে চলে গেল।

শামসুদ্দিন বারান্দা থেকে নেমে যখন অন্দরমহলের দিকে পা বাড়াতে যাবে, ঠিক তখনই ভেতরের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো সায়রা। সায়রাকে সে অবশ্য আজ নতুন দেখছে না, এই মির্জা বাড়িতে সায়রার মা বহু বছর ধরে কাজ করে আসছে এবং সেই ছোটবেলা থেকেই মেয়েটিকে সে এই বাড়ির বিশাল উঠোনে আপনমনে ছুটে বেড়াতে দেখেছে। এই জমিদার বাড়ির মানুষের একটু-আধটু প্রশ্রয়ে সায়রা অল্পস্বল্প পড়াশোনাও শিখেছে, নিজের মনে গুছিয়ে চিঠি পড়তে পারে, সাধারণ হিসাব-নিকাশও তার মাথায় চট করে খেলে যায়। কিন্তু এত বছর ধরে এই বাড়ির একটা অতি পরিচিত চেনা অংশ হয়ে থাকা সত্ত্বেও, শামসুদ্দিন কেন যেন কোনোদিন সায়রাকে আলাদা কোনো চোখ দিয়ে দেখেনি; আজ বিকেলের এই পড়ন্ত মায়াবী আলোয় কেন জানি তার চোখ দুটো সায়রার মায়াবী মুখের ওপর গিয়ে আটকে গেল। সায়রা প্রথমে সংকোচে চোখ দুটো মেঝের দিকে নামিয়ে নিল এবং আলতো করে পাশ কাটিয়ে সরে দাঁড়াতে চাইল, কিন্তু শামসুদ্দিন হুট করেই গম্ভীর গলায় বলে উঠল, — দাঁড়াও।

সায়রা পা থামিয়ে অবাক হয়ে তাকাল। শামসুদ্দিন তার কাখে থাকা পিতলের কলসটার দিকে তাকিয়ে একটু ভ্রু কুঁচকে বলল, — এত বড় কলস নিয়ে একা একা পুকুরঘাটে যাচ্ছ কেন? সায়রা তার স্বভাবসুলভ শান্ত কিন্তু স্পষ্ট গলায় উত্তর দিল, — পারব সাহেব, আমার কোনো অসুবিধা হবে না। শামসুদ্দিনের মুখটা মুহূর্তেই একটু শক্ত হয়ে গেল, উন্মেচিত হলো তার সহজাত মির্জা বংশের সেই চিরচেনা জেদ। সে বলল, — আমি তোমার পারা কিংবা না-পারার কথা জিজ্ঞেস করিনি। কলসটা বড্ড ভারী, একা টানতে হবে না, কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাও। সায়রা কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে রইল, তারপর নিচু গলায় "জি আচ্ছা" বলে যখন উঠোন পেরিয়ে চলে যাচ্ছিল, শামসুদ্দিন নিজের অজান্তেই বেশ কিছুক্ষণ সেই চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল। পরক্ষণেই নিজের এই অদ্ভুত আচমকাই খেয়াল করে সে ঝট করে চোখ ফিরিয়ে নিল। বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা করিম বকস মিটিমিটি হাসছিল, কিন্তু সে মুখে কিছু বলল না আর শামসুদ্দিনও নিজের এই আচরণের কোনো কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না।

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথেই মির্জা বাড়ির অন্দরমহলে রাতের এক চিরাচরিত শান্ত পরিবেশ তৈরি হলো। সেকালের প্রথা অনুযায়ী বসার ঘরের সেজবাতি আর বারান্দার হ্যারিকেনগুলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। রওশন আরা বেগম বারান্দার আরামকেদারায় বসে মৃদু আলোয় তসবিহ জপছিলেন। ঠিক তখনই শামসুদ্দিন সেই ঘরের পাশ দিয়ে বসার ঘরের দিকে যাচ্ছিল এবং সায়রাকে মায়ের সাথে ভেতরের মহলে যেতে দেখে সে অবচেতনভাবেই এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। রওশন আরা ছেলের এই আকস্মিক থমকে যাওয়া খেয়াল করে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললেন, — কী রে শামসুদ্দিন, ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? শামসুদ্দিন একটু অপ্রস্তুত হয়ে চট করে বলল, — না মা, কিছু না। এই বলেই সে দ্রুত পায়ে সেখান থেকে চলে গেল। রওশন আরা ছেলের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কী যেন গভীর মনে চিন্তা করলেন, কিন্তু মুখে আর একটি কথাও বললেন না।

রাতের অন্ধকার যখন সিমুলতলী গ্রামকে পুরোপুরি গ্রাস করেছে, তখন মির্জা বাড়ির বিশাল উঠোনটা একদম নিঝুম হয়ে এলো। শামসুদ্দিন বারান্দার আরামকেদারায় একা একা বসে ঘুটঘুটে অন্ধকারের বুকে জোনাকিদের ওড়াউড়ি

দেখছিল। সায়রার সঙ্গে আজ তার সামান্যই কথা হয়েছে, আর সবকটি কথাই ছিল বড্ড সাধারণ। তবু মেয়েটার সেই শান্ত চোখের চাউনি আর অবাধ্য স্বভাবটা কেন যেন তার মনের মণিকোঠায় এসে বারবার দোলা দিচ্ছিল। বিশেষ করে বিকেলের সেই দৃশ্যটা—মেয়েটার সেই আত্মবিশ্বাসী গলায় বলা, "পারব সাহেব।" শামসুদ্দিন অন্ধকারে নিজের মনেই মৃদু হেসে ফিসফিস করে বলল, — মেয়েটার বুকে তো বেশ জেদ আছে দেখছি! ঠিক তখনই তার মনে হলো, তার নিজের জেদও তো দুনিয়ার কারও চেয়ে কম নয়; সম্ভবত এই চারিত্রিক মিলটার কারণেই মেয়েটার সেই ছোট্ট কথাটা তার বুকের ভেতর এত গভীরভাবে দাগ কেটে গেছে। পরদিন ভোরে যখন নতুন সূর্য উঠছে, তখন সায়রার সঙ্গে শামসুদ্দিনের আবার দেখা হয়ে গেল। শামসুদ্দিন বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিল, আর সায়রা তখন উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। দূর থেকে জমিদার সাহেবকে আসতে দেখে সায়রা তাড়াহুড়ো করে সুতির শাড়ির আঁচলটা মাথায় টেনে একপাশে বিনীতভাবে সরে দাঁড়াল। শামসুদ্দিন তার পাশ দিয়ে পার হয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, — কী সায়রা, কালকের কলসটা কি সত্যিই খুব বেশি ভারী ছিল? সায়রা ভীষণ অবাক হয়ে বড় বড় চোখ করে তাকাল, — জি? কেন সাহেব, হঠাৎ এই কথা জিজ্ঞেস করছেন? শামসুদ্দিন তার স্বভাবসুলভ রহস্যময় হাসি হেসে বলল, — না, এমনিই। এই কথাটুকু বলেই সে দ্রুত পায়ে সামনের বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। সায়রা সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর তার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে মিষ্টি ও লাজুক হাসি ফুটে উঠল। শামসুদ্দিন যাওয়ার পথে পেছন ফিরে সায়রার সেই অপরূপ হাসিটা দেখল কি না তা জানা গেল না, কিন্তু সেদিন সকালে প্রথমবার তার মনে হলো—এতদিন ধরে এই বিশাল মির্জা বাড়ির চেনা মানুষের ভিড়ে লুকিয়ে থাকা সায়রা নামের মেয়েটিকে সে হয়তো এতদিন সত্যিই কখনো চোখ মেলে খেয়ালই করেনি।

বিকেলের ম্লান আলোয় মির্জা বাড়ির প্রশস্ত বারান্দায় আরামকেদারায় বসে ছিলেন শামসুদ্দিন মির্জা। তাঁর কোলের ওপর একটা পুরোনো চামড়া বাঁধানো বই খোলা, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি একটা পাতাও ওল্টাননি। দৃষ্টি তাঁর উঠোনের ওপারে নিবদ্ধ। ঠিক তখনই ওদিকের বারান্দা দিয়ে যাওয়ার সময় সায়রা এক মুহূর্তের জন্য থামল। জমিদার সাহেবের গম্ভীর চাউনি দেখেই সে মাথাটা সামান্য নিচু করে একপাশে বিনীতভাবে সরে দাঁড়াল। দুজনের মধ্যে কোনো কথা হলো না, কোনো শব্দের আদান-প্রদান হলো না; অথচ এই নীরবতাই বিকেলটার ওপর কেমন একটা ভারী কুয়াশার মতো চেপে বসল। সায়রা চলে যাওয়ার পর শামসুদ্দিন একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে আবার বইয়ের পাতায় চোখ রাখলেন, কিন্তু ভেতরের এক অদ্ভুত অস্থিরতা তাঁকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল।

সন্ধ্যার মুখে রওশন আরা বেগম বারান্দায় এসে বসলেন। তাঁর বসার ভঙ্গিতে বংশের সেই আজন্ম আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট। ছেলেকে অমন গম্ভীর হয়ে বসে থাকতে দেখে তিনি বললেন, — সারাদিন তো মানুষের ভালো-মন্দ আর দরবার নিয়েই কাটালি শামসুদ্দিন, এখন আবার বই নিয়ে এমন পাথরের মতো বসে আছিস কেন?

শামসুদ্দিন মায়ের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, — কিছু পুরোনো হিসাব দেখছিলাম মা।

রওশন আরা ছেলের এই মন্থর উত্তরের আড়ালে থাকা সত্যটা যেন এক পলকেই ধরে ফেললেন। তিনি বললেন, — সায়রা মেয়েটাকে আজ অন্দরের একটা কাজ দিয়েছিলাম। মেয়েটা দেখতে দেখতে বেশ বড় হয়ে গেল, তাই না রে? শান্ত স্বভাব, অথচ চোখ দুটো বড্ড কথা বলে। তুই তো আগে এই বাড়ির মানুষজনকে ওভাবে খেয়াল করতিস না, ইদানীং তোকে একটু অন্যমনস্ক ঠেকে।

শামসুদ্দিন মায়ের এই সূক্ষ্ম কথার কোনো জবাব দিল না। মির্জা বংশের অহংকার বুকে চেপে সে কেবল নীরব রইল, কারণ সে ভালো করেই জানে—মায়ের চোখের তীক্ষ্ণতা এড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়।

সন্ধ্যার পর বারান্দার সেজবাতির আলোয় করিম বকস আর গ্রামের এক বৃদ্ধ এসে বসে ছিল। বৃদ্ধ তার নাতির কঠিন অসুখের বিবরণ দিতেই শামসুদ্দিন গম্ভীর মুখে করিম বক্সের দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে বলল, — কাল সকালে সদরের ভালো কবিরাজের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করো। ওষুধের যা খরচ লাগে, খাতা থেকে দিয়ে দিও।

বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতায় মাথা নোয়াতেই শামসুদ্দিন হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল। বৃদ্ধ বিদায় নিলে করিম বকস চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে নিচু স্বরে বলল, — সাহেব, আপনেরে ইদানীং কেমন যেন অন্যরকম ঠেকতাছে। মুখে রা কাড়েন না, তয় মানুষের কষ্টের কথা হুনলেই বুকটা ক্যামন যেন নরম হয়া ওটে। মির্জা বংশের কড়া স্বভাবটা তো আপনার মধ্যেও আছিল, তয় এই বদলটা কিসের?

শামসুদ্দিন চোখ তুলে করিম বক্সের দিকে তাকাল। সেই চোখে এমন এক চিলতে কঠোরতা ছিল যে করিম বকস তৎক্ষণাৎ মাথা নিচু করে চুপ করে গেল।

রাতের খাবারের পর রওশন আরা বেগম ছেলের ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর কণ্ঠে বরাবরের মতোই আদেশসূচক গাম্ভীর্য, — কাল সকালে জলদি উঠিস শামসুদ্দিন। পেছনের সেই পুরোনো বন্ধ ঘরটা একটু খুলতে হবে। তোর বাবার কিছু পুরোনো সিন্দুক আর জরুরি কাগজপত্র ওখানে রয়ে গেছে, অনেক দিন ওদিকের চাবি ঘোড়ানো হয় নাই।

শামসুদ্দিন এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সংক্ষেপে বলল, — আচ্ছা মা, সকালে আমি নিজেই চাবি নিয়ে আপনার সাথে যাব।

রওশন আরা ছেলের মুখের দিকে গভীর চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন, যেন অস্ফুটে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করলেন, তারপর আর কোনো কথা না বাড়িয়ে ধীর পায়ে ঘর থেকে চলে গেলেন।

রাত বারতে লাগলো, তখন পেছনের সেই পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটা অত্যন্ত ক্ষীণ খটখট শব্দ ভেসে এলো। শামসুদ্দিন কুপিটা হাতে নিয়ে সাবধানে করিডোর পেরিয়ে সেই ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ধুলোবালি আর পুরোনো কাঠের সেঁতসেঁতে গন্ধের মাঝে মেঝের ওপর তার চোখ আটকে গেল—একটা ছোট ভাঁজ

করা পুরোনো হলদেটে কাগজ। কুপিটা কাছে এনে ভাঁজ খুলতেই গোটা গোটা অক্ষরে লেখা কয়েকটি লেখা তার চোখে পড়ল:

"আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমি যা করেছি, তার জন্য হয়তো কোনো ক্ষমাই যথেষ্ট নয়। তবু বিশ্বাস করো, কাউকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না। কখনো যদি আমার কথা মনে পড়ে, শুধু এটুকু মনে রেখো—আমি ইচ্ছে করে কাউকে কস্ট দিতে  চাইনি। হয়তো একদিন সবকিছু বুঝতে পারবে।"

চিঠির নিচে কোনো নাম ছিল না। কিন্তু শেষ লাইনটা পড়া মাত্রই শামসুদ্দিনের চোখের সামনে দেশভাগের আগের একটা অন্ধকার রাত, একটা বন্ধ দরজা আর মায়ের কান্নাভেজা মুখ ভেসে উঠল। পুরোনো সেই পারিবারিক অপমানের ক্ষত যেন নতুন করে বুক চিরে রক্তক্ষরণ শুরু করল। অপমানে আর তীব্র ক্ষোভে শামসুদ্দিনের গলার ভেতর থেকে চাপা এক গর্জনের মতো শব্দ বের হলো, — ক্ষমা! এত বড় দুঃসাহস! সে চিঠির কাগজটা মুঠোর ভেতর চরম আক্রোশে কুঁচকে অন্ধকারের বুকে ছুড়ে ফেলে দিল।

বুক ভরে একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোরে পা রাখতেই সে দেখল, উঠোনের ওপারে সায়রা কুপি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কুপির কাঁপতে থাকা আলোয় সায়রার সেই শান্ত, লাজুক মুখটা নিশুতি রাতের বুক চিরে জমিদার শামসুদ্দিন মির্জার সমস্ত অহংকারকে যেন মুহূর্তেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। সায়রা দরজার কাছে পৌঁছে একবার ধীর স্থির চোখে পেছন ফিরে তাকাল। রাতের গভীর নিস্তব্ধতায় দূর থেকে আবারও দুজোড়া চোখ এক হয়ে গেল। শামসুদ্দিন মির্জা তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ঝট করে চোখ সরিয়ে নিল, কিন্তু নিজের অবাধ্য মনটাকে সে কোনোভাবেই সরাতে পারল না।

সকালের নরম রোদ মির্জা বাড়ির উঠোনে এসে পড়তেই রওশন আরা বেগম বারান্দায় শীতলপাটি পেতে বসেছেন। তাঁর সামনে পিতলের ছোট বাটিতে সাজানো চুন, সুপারি আর এলাচ। শামসুদ্দিন যখন ধীর পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল, তিনি মুখ তুলে পানের বাটাটা টেনে নিলেন। তাঁর স্বভাবসুলভ গম্ভীর কিন্তু স্নেহমাখা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, — এত সকালে আবার কোথায় বের হচ্ছিস?

শামসুদ্দিন রেলিংয়ে হাত রেখে শান্ত গলায় বলল, — দক্ষিণের দিকটা একবার দেখে আসব মা।

রওশন আরা পানটা ভাঁজ করতে করতে বললেন, — কালই তো ওদিকে গেলি। তোর এই এক স্বভাব, কোনোদিন একটু জিরোতে দেখলুম না। একটা কাজ শেষ হতে না হতেই আরেকটায় হাত দিবি। বসে থাকলে কি মানুষ মরে যায়?

— আমি তো বসে থাকার মানুষ নই মা।

রওশন আরা পানটা মুখে দিয়ে মৃদু হাসলেন, — তা তো জানিই।

মা-ছেলের এই সামান্য কথার মাঝেই উঠোনের ওপার থেকে বাইরের মানুষের কোলাহল ভেসে আসছিল। দেশভাগের পর থেকেই চারপাশের বাতাস কেমন যেন ভারী হয়ে উঠেছে। রওশন আরা হঠাৎ ছেলের দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বললেন, — শুনেছিস শামসুদ্দিন, শহরে নাকি আবার ভাষা নিয়ে বড় গোলমাল শুরু হয়েছে?

শামসুদ্দিন মায়ের মুখের দিকে তাকাল, — হ্যাঁ মা, শুনেছি।

— নিজের ভাষা নিয়ে মানুষের মনে এত ক্ষোভ কেন রে?

শামসুদ্দিন এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, — মানুষ তার নিজের মায়ের ভাষার অধিকার চায় মা। গ্রামে আমরা সবাই বাংলায় কথা বলি ঠিকই, কিন্তু অফিস-আদালত আর নথিপত্রেও তো মানুষের এই ভাষার স্বীকৃতি থাকতে হবে। ১৯৪৭ সালের পর দেশটা এক ধাক্কায় বদলে গেছে ঠিকই, কিন্তু মানুষের জীবন আর চিন্তা বদলাতে বড্ড সময় লাগে। শাসকের নাম বদলেছে, ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের ভেতরের কষ্টগুলো কি খুব একটা বদলেছে?

ছেলের কথা শুনে রওশন আরা বেগম কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, — এই কথাটা সবসময় মনে রাখিস শামসুদ্দিন। ক্ষমতা বদলালেই মানুষের ভাগ্য এক দিনে ফেরে না।

জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে মাত্র দু'বছর হলো। মির্জা পরিবারের সেই পুরোনো প্রতাপ আর আইনত নেই। কিন্তু গ্রামের মানুষের বহু বছরের পুরনো অভ্যাস তো আর এক দিনে মুছে যায় না। এখনো কোনো বড় বিপদে পড়লে তারা প্রথমে এই মির্জা বাড়ির উঠোনেই এসে দাঁড়ায়। শামসুদ্দিন সেটা জানে, তবে সে এটাও বোঝে—কাউকে ভয় দেখিয়ে হুকুম করার দিন এখন অতীত।

দুপুরের দিকে করিম বকস বারান্দার কাছে এসে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে এক ধরনের সংশয়। সে নিচু স্বরে বলল, — সাহেব, বাজার থেইকা কয়েকজন মানুষ আইছে। থানা থেইকা নাকি নতুন কী সব কাগজ আইছে, হেগো মধ্যে গ্রামের কয়েকজনের নাম উঠছে। হেরা ডরাইয়া আপনার লগে কথা কইতে চায়।

শামসুদ্দিন তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, — ওদের ডেকে আনো।

কিছুক্ষণ পর তিনজন গ্রামীণ মানুষ এসে বারান্দার নিচে দাঁড়াল। শামসুদ্দিনের ইশারায় তারা সামনের পিঁড়িতে বসল। তাদের মধ্যে একজন বয়স্ক লোক ইতস্তত করে বলল, — থানা থেইকা লোক আইসা এই কাগজে সই করতে কইছে মির্জা সাহেব। আমরা তো লেখাপড়া জানি না, এইসব কাগজের মারপ্যাঁচ বুঝবার পারি না।

শামসুদ্দিন কাগজগুলো হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখল। তারপর শান্ত গলায় বলল, — এগুলো কোনো জমির কাগজ নয়। সরকার থেকে গ্রামের মানুষের বসতবাড়ি আর নামের কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

বয়স্ক লোকটা অবাক হয়ে বলল, — আগে তো এইরকম নিয়ম আছিল না সাহেব। তাইলে কি কিছুই বদলায় নাই?

শামসুদ্দিন কাগজটা করিম বক্সের হাতে ফেরত দিয়ে বলল, — বদলেছে। শুধু নিয়মের কিছু অদলবদল হয়েছে। কিন্তু কাগজপত্রের এই দুনিয়াটা এত সহজে বদলায় না। তবে তোমরা কাগজ দেখে আর ভয় পেও না। কোনো কিছু না বুঝলে

জিজ্ঞেস করবে। সবকিছুর জন্য আমার ওপর নির্ভর করে থেকো না। এখন সময় বদলেছে, নিজের অধিকার নিজেকেই চিনে নিতে হবে।

লোকগুলো আশ্বস্ত হয়ে সেলাম জানিয়ে বিদায় নিল। তারা চলে যেতেই করিম বকস একটু হেসে বলল, — সাহেব, আপনে আগের মতো নাই। আগে তো কইতেন সব ঝামেলা আপনার কাছে লইয়া আইতে, আর এখন কন নিজেরা বুইঝা লইতে!

শামসুদ্দিন একটু হাসল, — মানুষকে সারাজীবন কোল দিয়ে রাখলে সে নিজের পায়ে দাঁড়াবে কী করে করিম বকস? সাহায্য করা আর কাউকে পঙ্গু করে রাখা এক জিনিস নয়।

বিকেলের দিকে শামসুদ্দিন যখন বারান্দা থেকে নামছিল, তখন উঠোনের এক পাশে সায়রাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। সায়রা জমিদার সাহেবকে আসতে দেখে বিনীতভাবে মাথা নিচু করল। শামসুদ্দিন তার মুখোমুখি হয়ে এক মুহূর্ত থামল। সায়রার সেই শান্ত, গম্ভীর চোখের দিকে তাকিয়ে সে ধীর গলায় বলল, — সায়রা, শুনলাম তুমি আজ সকাল থেকে অন্দরের অনেক কাজ করেছ। এখন আর বাড়তি কিছু করার দরকার নেই।

সায়রা একটু অবাক হয়ে বড় বড় চোখ করে তাকাল, — এখন তো সন্ধ্যার কিছু কাজ বাকি আছে সাহেব।

— যতটুকু খুব প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই করো। নিজের প্রতি একটু খেয়াল রেখো।

সায়রা মাথা নিচু করে মৃদুস্বরে বলল, — জি আচ্ছা।

শামসুদ্দিন আর কথা না বাড়িয়ে ধীর পায়ে সামনের বাগানের দিকে চলে গেল। সায়রা বেশ কিছুক্ষণ সেই চলে যাওয়া পথের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। রওশন আরা বেগম বারান্দা থেকে ছেলের এই আচরণ গভীর চোখে লক্ষ করছিলেন। সায়রা যখন শালটা নিয়ে তাঁর কাছে এলো, তিনি সায়রার মুখের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় এক চিলতে হাসলেন। সায়রা কিছুটা লজ্জিত হয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

রওশন আরা বললেন, — কিছু না দেখেও মানুষ কখনো কখনো অনেক কিছু বুঝে ফেলে রে সায়রা। সময় হলে মানুষ অনেক কিছুই নিজে নিজে বুঝে যায়।
সায়রা আর কোনো উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে রইল। বাইরে তখন সন্ধ্যার আজান ভেসে আসছিল। নতুন দেশের নতুন সময় ধীরে ধীরে শিমুলতলীর পুরোনো জীবনের ওপর নিজের ছাপ ফেলছিল। শামসুদ্দিন বারান্দার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারের বুকে জোনাকিদের ওড়াউড়ি দেখছিল। কেন জানি, আজকাল সায়রাকে চোখের সামনে দেখলে তার ভেতরের মির্জা বংশীয় সেই কঠিন মনটা আর আগের মতো স্থির থাকে না। সে নিজেকে বারবার বোঝাতে চাইল—এ শুধু একটা চেনা মানুষকে নতুন করে খেয়াল করা, এর বেশি কিছু নয়।
কিন্তু নিজের অবাধ্য মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যে কত কঠিন, তা শামসুদ্দিন মির্জা তখনও পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। তার ভেতরে খুব ধীরে, অত্যন্ত অগোচরে, এক আশ্চর্য পরিবর্তন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

রওশন আরা বেগম চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিলেন। শরীরটা বেশ কয়েকদিন ধরেই ভালো যাচ্ছে না, তবে আজ সকাল থেকে ক্লান্তিটা একটু বেশি। এক ধরণের অলস জ্বর-জ্বর ভাব, মাথাটা টিপটিপ করছে। মির্জা বাড়ির মস্ত বড় দালানটায় এই সময়ে সাধারণত একটা নিঝুম নীরবতা নেমে আসে, আজ শুনশান ভাবটা যেন একটু বেশি।
সায়রা যখন গ্লাসে করে গরম দুধ নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল, রওশন আরা তখনো চোখ খোলেননি। সায়রা বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। খালা, দুধটুকু খেয়ে নিন, শরীরটা তো একদম ছেড়ে দিচ্ছে।
রওশন আরা চোখ না খুলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর গলার স্বর কিছুটা ভারী, তুই আবার কখন থেকে আমার খাওয়া-দাওয়ার তদারকি শুরু করলি সায়রা? রেখে দে ওখানে, পরে খাব।

পরে খেলে তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে খালা। আপনি সকাল থেকে মুখে একটা দানাও তোলেননি। শরীর তো এমনিতেই দুর্বল লাগবে। সায়রা দুধের গ্লাসটা পাশের কাঠের টেবিলে রাখল। তার চোখে-মুখে এক ধরণের অনাড়ম্বর মায়া।

রওশন আরা চোখ মেললেন। মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনের ভেতরের জমেট বাঁধা ভাবটা যেন কিছুটা কেটে গেল। তিনি উঠে বসতে বসতে বললেন, তোর আমার ওপর এতো নজরদারি? আচ্ছা দে, তোর দুধের গ্লাস দে।

ঠিক তখনই ঘরের ভারী কাঠের দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকল শামসুদ্দিন। মুখে সবসময় একটা গম্ভীর ছায়া লেগে থাকে, যা মির্জা বাড়ির পুরুষদের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। মায়ের বিছানার পাশে সায়রাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে কিছুটা থমকে দাঁড়াল।

"মা, কী হয়েছে তোমার? মুখটা এমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন?

রওশন আরা মৃদু হাসলেন, কিছু হয়নি রে বাবা। বয়স হলে শরীর একটু-আধটু এদিক-ওদিক হবেই। তুই এত অস্থির হচ্ছিস কেন?

শামসুদ্দিন মায়ের কথার উত্তর না দিয়ে সায়রার দিকে তাকাল। চোখের দৃষ্টি তীব্র। সকাল থেকে এমন?

সায়রা কিছুটা ইতস্তত করে নিজের ওড়নাটা আঙুল দিয়ে মোচড়াতে মোচড়াতে বলল, "জি, সকাল থেকেই খালা কেমন যেন ঝিম মেরে রয়েছেন। কিছু খেতেও চাচ্ছেন না।

রওশন আরা সায়রাকে মৃদু ধমক দেওয়ার ভান করলেন, সায়রা! আমি ঠিক আছি।

শামসুদ্দিন মায়ের পাশে খাটের ওপর বসল। মায়ের হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল, মাথা ঘুরছে? জ্বর এসেছে কি?

না রে বাবা, তোরা সামান্য বিষয় নিয়ে বড্ড বেশি শোরগোল করিস। তুই তো দিন দিন একদম তোর বাবার মতো হয়ে যাচ্ছিস। সামান্য একটু মাথা ধরার জন্য লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে বসতিস।

শামসুদ্দিন দৃঢ় গলায় বলল, তুমি অসুস্থ হলে আমি চিন্তা করব না তো কে করবে মা? আমি করিম বকসকে পাঠাচ্ছি, গ্রামের কবিরাজ মশাইকে একবার দেখিয়ে নেওয়া ভালো।

রওশন আরা আপত্তি করতে চাইলেন, কিন্তু ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আর বাড়াবাড়ি করলেন না। সায়রাও পাশ থেকে ফিসফিস করে বলল, কবিরাজ কাকা একটু দেখে গেলে তো ক্ষতি নেই খালা। মনটাও শান্ত হবে।

শামসুদ্দিন উঠে দাঁড়াল, আমি করিম বকসকে এখনই বলে দিচ্ছি।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর রওশন আরা সায়রার দিকে তাকালেন। সায়রা, তুই শামসুদ্দিনকে বেশ ভয় পাস, তাই না?"

সায়রা যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে হাত-পা নেড়ে জিব কেটে বলল, আমাকে কী বলছেন খালা! আমি ওনাকে ভয় পাব কেন? তবে... ছোট মির্জা মানুষটা কেমন যেন একটু কঠিন। সহজে হাসেন না, কথা কম বলেন।

কঠিন? তোর সত্যিই মনে হয় ও কঠিন মানুষ? রওশন আরার ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি।

সায়রা জানালার বাইরে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, সবসময় মনে হয় না খালা। মানুষটা বাইরে থেকে যতোটা কড়া দেখায়, আসলে ভেতরটা বোধহয় তেমন না। মায়াদয়া আছে।

রওশন আরা আর কিছু বললেন না। কেবল সায়রার নিস্পাপ মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

খানিক বাদে কবিরাজ মশাই এলেন। কাঁধে তাঁর পুরনো কাপড়ের ঝোলা, হাতে ছোট একটা কাঠের বাক্স। তিনি রওশন আরাকে অনেকক্ষণ দেখে বললেন বেগম সাহেবা, ভয়ের কিছু দেখছি না। শরীরে পুষ্টির অভাব আর একটু ক্লান্তি। দুদিন একদম বিছানা থেকে উঠবেন না। আর এই ওষুধটা মধু দিয়ে দিনে দুবার খাবেন।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শামসুদ্দিন জিজ্ঞেস করল, কোনো গুরুতর সমস্যা নেই তো কবিরাজ মশাই?

না মির্জা সাহেব, চিন্তার কিছু নেই। তবে মায়ের শরীর, একটু দেখভাল তো করতেই হবে।কবিরাজ মশাই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

শামসুদ্দিন মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আজ থেকে তোমার ঘরের সব কাজ বন্ধ।

কবিরাজ মশাই যা বলেছেন, ঠিক তা-ই হবে।

তুই এখন আমাকে শাসন করছিস শামসুদ্দিন? জন্ম থেকে তোকে আমি মানুষ করলাম, আর আজ তুই আমাকে আদেশ করিস?" রওশন আরা কৃত্রিম রাগ দেখালেন।

ভালোর জন্য আদেশ করা যায় মা।শামসুদ্দিনের মুখে ক্ষণিকের জন্য একটা হালকা হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সে সায়রার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি মায়ের জন্য একটু পাতলা জাউ ভাত বা সুজি রান্না করে দাও।

সায়রা মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা।

সায়রা ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর ঘরের ভেতর একটা গভীর নীরবতা নেমে এল। রওশন আরা ছেলের দিকে তাকালেন।

মেয়েটা ভালো, তাই না শামসুদ্দিন?

শামসুদ্দিন জানালার বাইরে দৃষ্টি দিয়ে বলল, হুম।

শুধু হুম? আমি কী বলছি তুই মন দিয়ে শুনছিস?

শুনছি মা। বলছ সায়রা মেয়েটা ভালো।

রওশন আরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু সোজা হয়ে বসলেন। শামসুদ্দিন, তোর বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে। সংসারে একজন মানুষের প্রয়োজন। একা একা একটা মানুষ কতদিন থাকা যায়?

শামসুদ্দিনের মুখটা মুহূর্তের মধ্যে পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল। মা, আমি আগেই বলেছি, বিয়ে করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। এসব নিয়ে কথা না বললেই ভালো হয়।

তুই না চাইলেই তো হবে না রে বাবা। আমি তোর মা, আমার একটা ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে। আমি সায়রার কথা ভাবছি।

কথাটা শুনে শামসুদ্দিন মায়ের দিকে ঘুরে তাকাল। তার চোখের তারা স্থির। তুমি সায়রার কথা ভাবছ? ও তো আমাদের সমকক্ষ নয় মা। সমাজ, বংশের মর্যাদা— এসব তো তুমি জানো।

রওশন আরার গলায় এবার একটা প্রাচীন অভিজ্ঞতার সুর ফুটে উঠল, জমিদারি অনেক আগেই গেছে শামসুদ্দিন। এখন শুধু ভাঙা বাড়ি আর কিছু অহংকার ছাড়া আমাদের আর কী আছে? বংশ দিয়ে মানুষের বিচার হয় না রে বাবা, বিচার হয় তার স্বভাব দিয়ে। সায়রাকে আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি। ওর মতো মেয়ে মেলা ভার।

শামসুদ্দিন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। সে নিচু গলায় বলল, তুমি আমেনা বেগমের সাথে কথা বলতে চাও?

হ্যাঁ, যত দ্রুত সম্ভব আমি কথাটা পাড়তে চাই। তোর কি কোনো আপত্তি আছে? শামসুদ্দিন জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তার গলার স্বর শোনা গেল তুমি যা ভালো বোঝো করো মা। আমি কিছু বলব না।

আমেনা বেগমকে যখন রওশন আরার ঘরে ডেকে পাঠানো হলো, তখন চারপাশটা কিছুটা আবছা হয়ে এসেছে। আমেনা বেগম আঁচলে হাত মুছে অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেন। মির্জা বাড়ির এই অন্দরমহলে আসতে তাঁর কেমন যেন একটা দ্বিধা কাজ করে।

তিনি দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, আমারে ডাকছিলেন বেগম সাহেবা? হুনলাম আফনের শরীর নাকি আইজ ভালা না?

রওশন আরা বিছানায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তিনি হাত ইশারায় আমেনা বেগমকে কাছে ডাকলেন, এসো আমেনা, ভেতরে এসে বসো। শরীর এখন আল্লাহর রহমতে একটু ভালো।

আমেনা বেগম ঘরের মেঝেতে বসার উপক্রম করতেই রওশন আরা বললেন, মেঝেতে কেন? এই মোড়াটায় বসো।

আমেনা বেগম চাদরটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে মোড়ার এক কোণে বসলেন। তাঁর মুখমন্ডলে এক ধরণের শঙ্কা, আফনের শরীলের এই অবস্থা দেইখা আমার

নিজেরই জানডায় পানি আছিল না। আল্লাহ আফনেরে নেক হায়াত দান করুক।
তা... আমারে কোনো কামের কথা কইবেন?
রওশন আরা আমেনা বেগমের দিকে তাকালেন। তারপর একটু থেমে, গলার স্বর কিছুটা নরম করে বললেন, কাজের কথা নয় আমেনা। একটা পারিবারিক কথা। তোমার মেয়ে সায়রার বয়স তো হলো, ওর বিয়ের ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?
আমেনা বেগম যেন হঠাৎ কথাটা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি কিছুটা থতমত খেয়ে বললেন, সায়রার বিয়া? সায়রার বিয়ার কথা আর কী ভাবুম বেগম সাহেবা? আমরা গরিব মানুষ, আমাগো লাইগা তো আর ভালো ঘর সহজে আইব না। কোনোমতে একটা গতি করতে পারলেই অয়।
রওশন আরা শান্ত গলায় বললেন, আমি একটা কথা বলতে চাই। তুমি আগে পুরোটা শুনবে, তারপর তোমার মত বলবে। মাঝখানে কোনো কথা বলবে না।
আমেনা বেগম মাথা নেড়ে নিচু গলায় বললেন, আইচ্ছা বেগম সাহেবা, আপনে কন। আমি হুনতাছি।
আমি চাই সায়রার বিয়ে শামসুদ্দিনের সঙ্গে হোক।
আমেনা বেগম স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ঘরের ভেতরের বাতাস যেন মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। কিছুক্ষণের জন্য তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হলো না। তিনি বড় বড় চোখে রওশন আরার দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন কানে কোনো ভুল শুনেছেন।
তারপর খুব নিচু গলায় কাঁপাকাঁপা স্বরে বললেন, বেগম সাহেবা... আপনে এইডা কী কইতাছেন?ছোট মির্জার লগে আমার সায়রা? এইডা ক্যামনে অয়
ভয় পেয়ো না আমেনা। আমি তোমার মেয়েকে কোনো দয়া করে আমার ঘরে আনতে চাইছি না। আমি ওকে নিজের চোখে অনেকদিন ধরে দেখেছি। ওর চরিত্র, ব্যবহার, মন—সবকিছুই আমার অসম্ভব ভালো লাগে।
আমেনা বেগমের চোখের কোণ বেয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললেন, আমি তো জীবনেও এমন কথা সপনেও ভাবতারি নাই। আমাগো কপাল কি এতোই ভালো?

ভাবার অধিকার সবারই থাকে আমেনা। মানুষ ছোট হতে পারে, কিন্তু মানুষের মন ছোট হওয়া ঠিক নয়।

আমেনা বেগম মাথা নিচু করে রইলেন। তাঁর মনের ভেতরের শঙ্কাটা দূর হচ্ছিল না। তিনি ফিসফিস করে বললেন, কিন্তু বেগম সাহেবা, দশের মানুষ তো ভালো কইব না। পাঁচজনে পাঁচ কথা তুলব। আপনাগো লগে কি আমাগো বংশ মেলে?

মানুষের কথা আমি সামলাব আমেনা। মির্জা বাড়ির সিদ্ধান্ত মির্জা বাড়িই নেবে, বাইরের মানুষ নয়।

আমেনা বেগম একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন, আইচ্ছা, শামসুদ্দিন সাহেব কি এই বিয়াতে রাজি আছেন?"

রওশন আরা একটু থামলেন। বাইরে তাকালেন। ওর সঙ্গে কথা হয়েছে। ও কোনো আপত্তি করেনি।

আমেনা বেগম এবার একটু আশ্বস্ত হলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বললেন, সায়রা কী কইব বেগম সাহেবা? ও তো ছোড মানুষ, কিছু বোঝে না।

সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমেনা। এই বিয়েতে সায়রার মত থাকাটা সবচেয়ে জরুরি।

আপনে কি ওর লগে কথা কইছেন?

না, আগে সায়রার মায়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার মনে করেছি। তোমার সায় থাকলে, তবেই সায়রার সঙ্গে কথা হবে।

আমেনা বেগম আবার চোখ মুছে বললেন, আমার সায়রার লাইগা এর থেইকা বড় ভাগ্য আর কী হইতে পারে! আপনে যহন কইতাছেন, তখন আমার আর কোনো কথা নাই।

রওশন আরা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ভাগ্যের কথা বলো না আমেনা। বিয়ে মানে শুধু ঘরে তুলে নেওয়া নয়, সারা জীবনের সম্পর্ক। সায়রা যদি নিজের থেকে রাজি না হয়, তবে এই কথা আর এক পা-ও এগোবে না।

জি, বেগম সাহেবা।

আর একটা কথা।রওশন আরার গলা এবার বেশ গম্ভীর শোনাল, শামসুদ্দিন কঠিন মানুষ। ওর স্বভাব তুমি বাইরে থেকে যতটা জানো, আমি তার চেয়ে বেশি জানি। ও একটু চাপা স্বভাবের। তাই সায়রাকে কোনো কথা না বুঝিয়ে জোর করে রাজি করাবে না। ও যেন নিজের ইচ্ছায় সিদ্ধান্ত নেয়।

আমেনা বেগম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, সায়রা আপনার কথা কোনোদিন অমান্য করব না। আপনে যা কইবেন, ও মাথা পাইতা লইব।

রওশন আরা মৃদু গলায় বললেন, আমি চাই না সে আমার খাতিরে বা আমার কথা মানার জন্য এই বিয়ে করুক। আমি চাই সে নিজের মন বুঝে সিদ্ধান্ত নিক।

আমেনা বেগম এবার রওশন আরার দিকে তাকিয়ে মুখের শঙ্কা কাটিয়ে মৃদু হাসলেন, আপনে আমার মাইয়াডারে বড্ড ভালোবাসেন, বেগম সাহেবা। ওরে নিজের বুকের মইধ্যে রাখছেন।

রওশন আরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর একটু উদাসীন গলায় বললেন, মেয়েটাকে আমি অনেকদিন ধরে দেখছি আমেনা। কখন যে নিজের মেয়ের মতো হয়ে গেছে, আমি নিজেও টের পাইনি।

আমেনা বেগমের চোখ আবার ভিজে উঠল। তিনি মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালেন, আল্লাহ আফনের মঙ্গল করুক। আমি তইলে অহন যাই?

হ্যাঁ, তুমি এখন যাও। সায়রার সঙ্গে কথা বলো। তবে তাড়াহুড়ো করে বা ভয় দেখিয়ে কিছু বলবে না।

আইচ্ছা, জি।

আমেনা বেগম দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে তাকালেন। মনের ভেতরের শেষ কৌতূহলটা আর চেপে রাখতে পারলেন না। নিচু গলায় বললেন, বেগম সাহেবা...

কি?

ছোট মির্জা কি আসলেই মনের থেইকা রাজি?"

রওশন আরা মৃদু হেসে বললেন, "ওর মুখে সরাসরি 'রাজি' কথাটা শোনা সহজ নয় আমেনা। তবে সে পুরোপুরি অরাজিও নয়। ওর নীরবতা মানেই সায়।

আমেনা বেগমও হালকা হাসলেন,